প্রবাহ

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

২০০০-২০০১

শ্রী ভগীরথ সরকার
সহ গ্রন্থাগারিক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

শুভেচ্ছা সহ —
গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
১৬/৪/২০০১

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
মেদিনীপুর-৭২১১০২

VIDYASAGAR UNIVERSITY
Ananda Deb Mukhopadhyay
Vice- Chancellor

শুভেচ্ছাবার্তা

এ বছরে জিয়োগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকা প্রবাহ প্রকাশনার সংবাদে খুবই আনন্দিত। বিশেষ করে বর্তমান জগতের পরিবেশ বিষয়ক প্রবন্ধের ওপর এই প্রকাশনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী। এই সংস্থার প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য এবং সকলকে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমার দৃঢ় ধারণা। এই উদ্যোগ স্থায়ী হোক ও সফল হোক। ভবিষ্যতে এই ধরণের উদ্যোগ আরও বৃদ্ধি পাক এই আমার কামনা।

শুভেচ্ছাসহ

২রা এপ্রিল ২০০১ আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়

Midnapore 721 102 West Bengal India
Fax : (91) 03222-62329 / 61009
E-mail : vidya@dte.vsnl.net.in

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় জিয়োগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন
কর্মসমিতি : ২০০০-২০০১

প্রধান উপদেষ্টা :	অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়, উপাচার্য
সভাপতি :	অধ্যাপক গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল ও পরিবেশ ব্যবস্থাপন বিভাগ
সহসভাপতি :	অধ্যাপিকা সুমনা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রধান সম্পাদক :	শুভঙ্কর আচার্য
কোষাধ্যক্ষ মণ্ডলী :	মধুমিতা ভূঞ্যা (প্রধান), নভেন্দু কর, বর্ণালী চট্টোপাধ্যায় ও মানসী পাত্র
সাংস্কৃতিক সম্পাদকমণ্ডলী :	চন্দন মিশ্র (প্রধান), শাশ্বতী ঘোষ, মিঠু বেরা, মৌমিতা মেট্‌লা ও শুভ্রা জানা
ক্রীড়া সম্পাদকমণ্ডলী :	দেবরাজ ঢালী (প্রধান), মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, পারিজাত সরকার ও দেবাশিস ঘোড়াই
পর্যটন সম্পাদকমণ্ডলী :	তাপস প্রধান (প্রধান), সুস্মিতা বাগ, সোমনাথ মাইতি, মৌসুমী পাল, রঞ্জিত জানা, শঙ্কর মণ্ডল ও সমরেশ দে
উদ্যান পরিচর্যা বিভাগ :	মালবিকা গায়েন (প্রধান), পীযূষ পাইক, নন্দিতা দাস ও সোমা সেনাপতি
সহায়ক মণ্ডলী :	দেবপ্রকাশ পাহাড়ী, উৎপল রায় ও পরিমল সরকার

প্রবাহ পত্রিকা-পরিচালন সমিতি (২০০০-২০০১)

প্রধান পৃষ্ঠপোষক :	অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়
প্রধান সহায়ক :	অধ্যাপক যোগেন্দ্রমোহন দেবনাথ ও অধ্যাপক ভূদেব রঞ্জন দে
প্রধান নিয়ামক :	বিনয় কুমার চন্দ
প্রধান সম্পাদক :	অধ্যাপক গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী যুগ্ম সম্পাদক :	শুভঙ্কর আচার্য ও চন্দন মিশ্র

সম্পাদকীয়

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে পরিবেশের বিভিন্নদিক নিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ ভাবনাচিন্তার এক সদর্থক প্রতিফলন এই প্রবাহ পত্রিকার প্রকাশিত রূপ। আজ থেকে প্রায় সাত বছর আগে ১৯৯৫ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল ও পরিবেশ ব্যবস্থাপন বিভাগের সূচনার মধ্যদিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনে নির্দিষ্ট পঠনপাঠনের পাশাপাশি পরিবেশ ভাবনা শুরু হয়। ১৯৯৭ সালে আমাদের পূর্বসূরীদের প্রচেষ্টায় এবং বিভাগীয় অধ্যাপকদের আন্তরিক সাহচর্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন। তখন থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিবছর আমাদের হাতে লেখা দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে; আর প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও আসতে থাকে নিয়মিত। গতবছর প্রবাহকে দেওয়াল পত্রিকা রূপের পাশাপাশি ছাপার অক্ষরে নিয়ে আসার একটা সাময়িক প্রচেষ্টা শুরু হলেও ফলপ্রসূ হয়নি, কারণ অর্থ সঙ্কুলানের অনিশ্চয়তা। সেই অনিশ্চয়তা এ বছরেও ছিল কিন্তু অ্যাসোসিয়েসনের সকলের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও জেদই আমাদের এই ঝুঁকি নিতে পথ দেখায়।অতি দ্রুততায় রচনা নির্বাচন করে এবং ছাপাখানার কাজ সমাধা করে এই পত্রিকা প্রকাশনা করে আনতে হয়ত কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে গেছে, কিন্তু লক্ষ্যের দিকে আমরা কিছুটা এগিয়ে যেতে পেরেছি এটাই সান্ত্বনা। লবটুলিয়ার অরণ্যে যুগলপ্রসাদ একমাত্র নিজের চেষ্টায় যে ফুল ফোটাত তা শুধু প্রকৃতি পরিবেশে ভালবাসার আনন্দকে জাগিয়ে তোলবার জন্যই।

গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
প্রধান সম্পাদক
এবং
শুভঙ্কর আচার্য ও চন্দন মিশ্র
কার্যনির্বাহী যুগ্ম সম্পাদক

মেদিনীপুর
২৮শে মার্চ ২০০১

সূচীপত্র

পরিবেশবিদ্যা শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব
অধ্যাপক গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১
বৃষ্টিপাত : প্রকৃতির নিয়মের বাইরে
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ৫
বন্যার আগ্রাসনে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ
সমীর মাইতি ৬
নর্মদা বাঁধ ও জলাধার : পরিবেশের লাভ-ক্ষতি
মালবিকা গায়েন ৭
অন্তরীক্ষে অরণ্যদ্রষ্টা
বর্ণালী চ্যাটার্জী ৯
জনসম্পদ বনাম জনবিস্ফোরণ
পীযূষ পাইক ১০
অকাল মৃত্যুর দিকে পৃথিবী !
সৌমিত্র মণ্ডল ১১
কুমেরু মহাদেশে শৈত্য কমে আসছে
চন্দন মিশ্র ১৩
মহাকাশে মহানক্ষত্র ইটা ক্যারিনি
মধুমিতা ভূঞ্যা ১৪
চোরাবালি
স্বর্ণালী আদক ১৫
আবহমণ্ডলে ওজনস্তর ও আমরা
রঞ্জিত জানা ১৬
বিপন্ন দীঘা সৈকত
তাপস প্রধান ১৭
দীঘার পর্যটন শিল্প বনাম ওদের বেঁচে থাকা
দেবপ্রকাশ পাহাড়ী ও উৎপল রায় ১৯
Educating Rural Children : The Problem of Access and Awareness
Sumana Bandyopadhyaya
Ranjan Jana & Soma Dey 22
Causes, Consequences and Management of Earthquake Disaster: An Analysis in the light of theRecent Events in Gujarat
Novendu Kar 25
Underground Water-Table Condition around Medinipur Township Area
Guru Prasad Chattopadhyay
Subhankar Acharya and Susmita Bag 30

Published and Printed by Dr. Jogendramohan Debnath, Registrar, Vidyasagar University, Medinipur, 721102, W.B. India, at N.B. Laser Writer, R-19 Dak-bunglow Road, Medinipur 721101, email : majeeb@dte.vsnl.net.in **PRICE- Rs. 25.00**

পরিবেশবিদ্যা শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব

অধ্যাপক গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক

ভূমিকা:

আজকের মানুষ সবচেয়ে বেশী চিন্তিত ও আশঙ্কিত তার পারিপার্শ্বিক জগতের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে, আর এই পারিপার্শ্বিক জগৎই হল তার পরিবেশ। প্রকৃত অর্থে পরিবেশ হল সামগ্রিক পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল যার মধ্যে মানবকেন্দ্রিক বাস্তুসংস্থানগত বিষয়সমূহ কাজ করে চলে। এইজন্যই পরিবেশ সম্পর্কিত ধারণা মূলত বাস্তুসংস্থানগত ধারণার ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। ১৮৫৯ সালে ফরাসী প্রাণীবিদ্যাবিশারদ St Hilaire এই বিষয়টির নামকরণ করেন Ethology । পরে ১৮৬৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী Reiter এই বিষয়টিকে পরিচিতি দিতে Oikology নামক শব্দটির প্রবর্তন করেন; গ্রীক ভাষায়, Okios শব্দটির অর্থ হল 'গৃহ' এবং Logos শব্দটির অর্থ 'অধ্যয়ন'। অতএব আক্ষরিক অর্থে এ হল গৃহগত জীবজগৎ। ১৮৬৯ সালে ইংরাজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী Ernest Haeckel ই প্রথম Ecology শব্দটির মূল ব্যাখ্যা করেন। তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী জীবজগৎ ও তার অজৈব পরিবেশের মধ্যে সার্বিক পারস্পরিক সম্পর্কই হল Ecology বা বাস্তুতন্ত্র। Haeckel কে অনুসরণ করে পরে ১৮৭৪ সালে বিজ্ঞানী George Perkins Marsh পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ বিনাশের ফলে আগামী দিনে জীবজগতে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

বাস্তুতন্ত্র এবং বাস্তুসংস্থান বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান

মূলত বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে প্রকৃতি জগতের গঠন ও ধারা কে নিয়ে, এবং প্রাকৃতিক জগতের অঙ্গ হিসাবে মানুষ এই গঠন ও ধারাকে মানিয়ে নিয়ে চলে। বাস্তুসংস্থান হচ্ছে অজৈব প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের সম্মিলিত ভাবে টিকে থাকার কর্মধারা। এই টিকে থাকা বা বেঁচে থাকার প্রয়াসের মধ্যে নিয়ত চলেছে জৈব ও অজৈব জগতের মধ্যে পারস্পরিক শক্তি বা বলের আদান প্রদান, আর এর মধ্যদিয়েই সৃষ্টিজগতে গড়ে ওঠে এক স্বাভাবিক ভারসাম্য। পরিবেশ বিজ্ঞানের মধ্যে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির রূপরেখা অনুধাবনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগের পরিবেশে বিভিন্ন অবস্থার প্রভাব, বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি।

বিজ্ঞানের নতুন শাখা রূপে বিংশ শতাব্দীতে পরিবেশ বিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশ

মানুষের মধ্যে পরিবেশকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা সভ্যতার প্রথম পর্যায় থেকেই ছিল এবং এখনও আছে। তবে পরিবেশ সচেতনতা বিশেষভাবে গড়ে উঠতে থাকে বিংশ শতাব্দীতে চল্লিশের

দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই, যখন মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করতে শুরু করে যে জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের ওপর তাদের প্রায় সীমাহীন যথেচ্ছাচারের ফলে আগামী দিনে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে চলেছে। এই উপলব্ধির কারণগুলি হল এই রকম —(ক) যুদ্ধের সরাসরি প্রভাবে আণবিক বোমার মত আরও অন্যান্য বিস্ফোরণ ও যুদ্ধাস্ত্রের দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি, (খ) অতি দ্রুত জনবৃদ্ধি ও নগরায়ন, (গ) এযাবৎ অব্যবহৃত প্রাকৃতিক অঞ্চল, যেমন তৈগা অরণ্য, মেরুপ্রদেশীয় এবং পার্বত্য অঞ্চল থেকে ব্যাপক ভাবে সম্পদ আহোরণ, (ঘ) কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নানাপ্রকার রাসায়নিক সার ও অন্যান্য দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং (ঙ) যানবাহন ও শিল্পোন্নয়নের জন্য অধিকতর জ্বালানী ব্যবহারের ফলে আবহমন্ডলে ক্রমবর্ধমান দূষণ।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবেশ বিজ্ঞান অধ্যয়নের গুরুত্ব

বিজ্ঞানের নবতম ও গতিশীল শাখা হিসাবে পরিবেশ বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বিগত তিনটি দশক যাবৎ, অর্থাৎ ১৯৭০ সাল থেকে। পরিবেশ বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষার গুরুত্বও মানুষ এখন দ্রুত উপলব্ধি করতে শিখছে কারণ এই পরিবেশ মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী, সমাজব্যবস্থা, তথা মানব জাতি ও তার ধারক এই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। যন্ত্রসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিগত একশ বছর যাবৎ প্রাকৃতিক জগতের ওপর মানুষের ক্ষতিকারক প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে সামগ্রিক ভাবে পরিবেশের যে পরিমান ক্ষতি হয়েছে এবং আজও হয়েচলেছে তা অপূরনীয়। এই ক্ষতিপূরণের এবং পরবর্তীকালে মানুষের তথা সমগ্র জীবজগতের স্বার্থের তাই এখন সারা পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশে সরকারী এবং বেসরকারী স্তরে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে উন্নয়নের যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তাকে বলা হয় স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন (Sustainable Development)। এইজন্য দেশের যে কোন অঞ্চলে ছোট বড় সবরকম উন্নয়ন প্রক্রিয়া কার্যকরী করার আগে পরিবেশগত প্রভাব পর্যালোচনা (Environmental Impact Assessment) বিশেষ ভাবে জরুরী পড়েছে। আর এর মধ্য দিয়েই পরিবেশ বিজ্ঞানের নিত্যনতুন শাখার সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পরিবেশ সমস্যা এবং পরিবেশ ভাবনা বিশেষভাবে সৃষ্টি হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে এই সমস্যা তীব্রতর হয় এবং ৬০এর দশক থেকে পরিবেশ সমস্যা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে এই বিষয়ে সারা পৃথিবীতে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৭০ এর দশক থেকে বিশ্বব্যাপী দ্রুত জনবৃদ্ধি, ব্যবহার্য সম্পদের দ্রুত অবক্ষয় এবং পরিবেশ অবনমনের সার্বিক প্রতিক্রিয়ার দিকে পরিবেশবিদদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ১৯৭২ সালে স্টকহোম শহরে আয়োজিত সম্মিলিত জাতিসংঘের মানবীয় পরিবেশ সম্মেলনে (United Nations' Conference on Human Environment) পরিবেশ অবনমনের বিষয়গুলি প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করে পরিবেশবিদ্যা শিক্ষার (Environmental Education) এর গুরুত্ব আলোচিত হয়। এই সম্মেলনের মধ্যদিয়েই জাতিসঙ্ঘের পরিবেশ

পরিকল্পনা (United Nations' Environment Programme) রচিত হয়।

পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পরিকল্পনার কথা মাথায় রেখে জাতিসংঘ ১৯৭০ এর দশক থেকে একাধিক সম্মেলনের আয়োজন করে।এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত জনবসতি বিষয়ক সম্মেলন, ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত মরুপ্রসারণ সমস্যা বিষয়ক সম্মেলন এবং ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত নবীন ও পূনর্ণবীকরণযোগ্য সম্পদ বিষয়ক সম্মেলন। তবে ১৯৯২ সালের জুনমাসে ব্রাজিলের রিও -ডি-জেনিরো শহরে অনুষ্ঠিত জাতিসঙ্ঘের পরিবেশ এবং উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনটি (United Nations' Conference on Environment and Development) এপর্যন্ত অনুষ্ঠিত পরিবেশ সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। এই সম্মেলনটি আবার Rio Summit বা Earth Summit নামেও খ্যাত। পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনগুলির মধ্যে ঐ সম্মেলনটি এপর্যন্ত বৃহত্তম এবং এখানে পৃথিবীর মোট ১৭৮টি দেশের জনপ্রতিনিধিরা যোগদান করেন। এই সম্মেলনে ১৬৭টি দেশ জীব-উদ্ভিদ সংরক্ষণের (তথাকথিত জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের) সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এবং ১৫০টি দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়নির্ভর সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত হয়। সর্বোপরি পরবর্তী দিনগুলিতে সর্বক্ষেত্রে স্থিতিযোগ্য উন্নয়ণ ব্যবস্থার (Sustainable Development) দিকে দেশগুলির দৃষ্টি আকর্ষন ও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের জন্য জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদকে একটি কমিটি গঠন করতে বলা হয়, যার নাম দেওয়া হয় জাতিসঙ্ঘের স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন কমিশন (UN Sustainable Development Commission)। এই সম্মেলনে যদিও বনবিষয়ক (Forestry) এবং মরুবিস্তার বিষয়ক (Desertification) আলোচনাগুলিকে পরবর্তী সম্মেলনের জন্য সরিয়ে রাখা হয় সার্বিকভাবে এই সম্মেলন সফল হিসাবেই চিহ্নিত হয়েছে ; বাস্তবত পৃথিবীর সবকটি দেশই সরকারী পর্যায়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে অবিলম্বে সকলে একত্রিত হয়ে যথাযোগ্য পরিবেশ বিধান (Environmental Legislation) গ্রহণকরা উচিৎ। এই সম্মেলনের ফলস্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে পরিবেশ গবেষণা ও এবং উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে বলাযায় ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯২ সাল এই সময়কালের মধ্যে বিজ্ঞানীদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে ধ্যানধারণা এবং এর উন্নয়ন সম্পর্কে চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে বদলে যায়।

পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও নির্দেশিকা

পরিবেশ সম্বন্ধীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্যই হল মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটানো। জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে ১৯৭৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার বিলিসি (Tbilisi) তে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পরিবেশ শিক্ষার সম্মেলনে পরিবেশ শিক্ষার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য ও নির্দেশিকা নির্ধারিত হয়।

পরিবেশ শিক্ষার উদ্দেশ্যঃ (ক) পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা, (খ) পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণের

প্রতি কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিকরা, (গ) পরিবেশের সমস্যা নির্ধারণ ও তার প্রতিকারের জন্য কর্মদক্ষতার সৃষ্টিকরা, (ঘ) আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধ ও দায়িত্বের কথা মনে রেখে পরিবেশের মূল্যায়ন করা এবং (ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণের কথা মনে রেখে তার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা।

পরিবেশ শিক্ষার নির্দেশিকা ঃ (ক) পরিবেশের সামগ্রিক রূপ অর্থাৎ প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সমন্বয়কে বিবেচনা করে তার রূপরেখার অনুধাবন করা, (খ) মানুষের ধারাবাহিক জীবনের প্রেক্ষাপটে ও আঙ্গিকে পরিবেশকে অনুধাবন করা, (গ) পরিবেশ গঠনকারী বিষয়গুলির পারস্পরিক যোগসূত্র নির্ধারণ করে পরিবেশকে উপলব্ধি করা, (ঘ) পরিবেশ সমস্যারোধ ও প্রতিকারের প্রয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা, (ঙ) স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করা, (চ) বর্তমানে পরিবেশের অবস্থার প্রতি মনোসংযোগ করা, (ছ) উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজনে পরিবেশগত বিষয়গুলিকে বিবেচনা করা, (জ) পরিবেশগত বিষয়ের জটিল দিকগুলির কথা মনে রেখে তার সমস্যা সমাধানের দক্ষ ব্যবস্থা নির্ণয় করা, (ঝ) পরিবেশসমস্যা প্রতিরোধ স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব নির্ধারণ করা, (ঞ) পরিবেশের প্রতিটি বিষয় নিয়ে নিরন্তর পড়াশোনার ক্ষেত্র তৈরী করা, (ট) পরিবেশ সমস্যা প্রকৃত কারণগুলি অনুধাবনের ব্যাপারে শিক্ষানবীশদের সহায়তা করা, (ঠ) জীবনযাত্রার প্রতিটি পর্যায়ে পরিবেশ সংবেদনশীলতার মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয় সমূহের যথাযথ মূল্যায়ণ করা এবং (ড) পরিবেশ পরিকল্পনায় শিক্ষানবীসদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যাতে কার্যকরী করতে পারে সে বিষয়ে তাদের সহায়তা করা।

ভারতে পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব

ভারতের মত বিশালদেশে পরিবেশ বৈচিত্র্য অত্যন্ত ব্যাপক। দেশের বিশাল স্থলভাগের মধ্যে ভূতত্ত্ব, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ, জীবজগৎ, জনগোষ্ঠী, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বৈচিত্র্য অসীম। দেশের জনগণের পঞ্চাশ শতাংশের ও বেশী শিশু ও স্ত্রীলোক। এইজন্য এদেশে পরিবেশ শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিকভাবে নারীসমাজ এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই পরিবেশ শিক্ষার প্রথম পর্বে তাদের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যমান, পরিবারকল্যাণ, গ্রামীন উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের দেশে এযাবৎ গড়ে ওঠা দুই শত বা তার বেশী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তত একশ পঞ্চাশটি মানুষের মধ্যে পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করার কর্মকান্ডের সঙ্গে সরাসরি ভাবে যুক্ত। এইজন্য ঐসকল প্রতিষ্ঠানগুলিকেই মানুষের মধ্যে পরিবেশ শিক্ষা বিস্তারের কাজে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে সার্বিক কর্তৃত্বমূলক ও সমান্তরাল কর্মসূচীর নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রূপায়নে দায়িত্ব নিতে হবে সরকারী প্রশাসনিক স্তরে। আধুনিক জটিল যন্ত্র সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন ব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী করার জন্য পরিবেশ শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচী বর্তমান যুগে অবশ্যগ্রহনীয় ও বাধ্যতামূলক। ❑

বৃষ্টিপাত ঃ প্রকৃতির নিয়মের বাইরে

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, দ্বিতীয় বর্ষ

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে দিন দিন বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় এবং কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে জলের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের জন্য বিজ্ঞানীদের গবেষণা শুরু হয়েছে।খরা, দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি জনিত পরিস্থিতির মোকাবিলার ক্ষেত্রেও এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ।

কৃত্রিম বৃষ্টিপাত বলতে বোঝায় কৃত্রিম উপায়ে ভূ-পৃষ্ঠে বৃষ্টিপাত ঘটানো। এ ক্ষেত্রে মেঘ অবশ্যই থাকবে কিন্তু সবসময় মেঘ বা বৃষ্টি স্বাভাবিক ভাবে বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে কৃত্রিম ব্যবস্থা অবলম্বনে বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়।

জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু শীতলতার সংস্পর্শে এসে শিশিরাঙ্কে পৌঁছলে তা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণাতে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জমাট বেঁধে আকাশে ভাসতে থাকে। এইরূপ ভাসমান অতিক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি হল মেঘ। এই মেঘ আবার দু-ধরনের—উষ্ণ ও শীতল মেঘ। এই দু-ধরনের মেঘ থেকেই কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়।

১৯৪৬ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী Vincent J. Schaefer শীতল মেঘ থেকে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটান।কঠিন কার্বনডাই অক্সাইড অথবা শুষ্ক বরফ ব্যবহার করে মেঘের তাপমাত্রাকে -40^0 C তে নামিয়ে আনা হয়। এই শীতল মেঘের উপরের অংশে বিমানের সাহায্যে Pellet drop করা হয়। প্রত্যেকটি Pellet -40^0 C এর নীচে ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি পাতলা স্তর সৃষ্টি করে। এই স্তর থেকে জলকণার সঞ্চার হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। কয়েক কিলোমিটার ব্যাপী মেঘ থেকে বৃষ্টিপাতের জন্য মাত্র কয়েক পাউণ্ড শুষ্ক বরফের প্রয়োজন হয়। পরবর্তীকালে অস্ট্রেলিয়া,কানাডা,সাউথ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়েছে। নিউইয়র্কের General Electric Research Laboratory তে সিলভার আয়োডাইড ব্যাবহার করেও শীতল মেঘ থেকে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানোর পরীক্ষা সফল হয়েছে। তবে এই ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশী ব্যায়বহুল। ❑

বন্যার আগ্রাসনে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ

সমীর মাইতি, প্রথম বর্ষ

বন্যা নামক প্রাকৃতিক বিপর্যয় মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহাসিক কাল থেকে নিয়মিতভাবে চলে আসছে। প্রতিবছর এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে প্রায় ২৪ লক্ষ মানুষ। এ ছাড়া গবাদি পশুর জীবনহানির পাশাপাশি চাষবাসের জমি বিপুল পরিমানে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। যে গঙ্গা পবিত্র নদী হিসাবে পরিচিত সেই গঙ্গা এখানকার মানুষের জীবনে অভিশাপ রূপে পরিচিত হচ্ছে। তার কারণ গঙ্গার দ্রুত ও নিয়মিত গতিপথ পরিবর্তন। বিশেষত ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরির পর গঙ্গার চরিত্র যেন অনেক বদলে গেছে। ব্যারেজের উজানে বিস্তীর্ণ কৃষি জমি বালিতে ঢেকে গেছে। বন্দী গঙ্গার আক্রোশে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম, নগর, বাজার ও স্কুল। ধূলিয়ান শহরকে ৭.৬ কিলোমিটার পিছিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক। আস্তে আস্তে গঙ্গা ও পদ্মা পাড় ভেঙে দুই আত্মা এক হতে চলেছে। যার ফল হিসাবে বলা যায় মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার এক বিশাল অংশ জলের তলায় চলে যাবে। কয়েকস্থানে এই দুই নদীর মধ্যে ব্যবধান রয়েছে মাত্র ১.৪ কিলোমিটার। পদ্মার পাড় ভাঙনে দ্রুত বদলে যাচ্ছে মালদহ ও মুর্শিদাবাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। পদ্মা চিরকালই কীর্তিনাশা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> " তীব্র স্রোত যেন চকচকে খড়্গের মত, দুই
> ধারের তীর একেবারে অবহেলে ছারখার করে
> দিয়ে চলেছে।"

রাজমহলের পাহাড়ের কঠিন শিলায় ধাক্কা খেয়ে গঙ্গার জলস্রোত প্রায় ৪৫° বাঁক নিয়ে মানিকচক ও কালিয়াচক অঞ্চলকে আঘাত করে। তার আঘাতে সেচ দপ্তরের তৈরি স্পার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের বাঁধ খড়কুটোর মত ভেসে যায়। যেমন ১৯৯৯ সালে ১৩ কোটি টাকা ব্যায়ে নির্মিত ২৪ নম্বর স্পারটি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রবল স্রোতে ভেঙে যায়। ফারাক্কা ব্যারেজ এই বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যার্থ হয়েছে। রাজমহল থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত প্রায় ১০৪ কিমি গঙ্গার গতিপথ বদলে যাওয়ায় গঙ্গার জল ফুলেফেঁপে উঠছে। ফারাক্কা ব্যারেজে বন্দী গঙ্গা পুরনো পথে ফিরে মুক্তি চাইছে। গত ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সালে ফারাক্কায় গঙ্গার জলস্তর সবকালের রেকর্ড ভেঙে ২৬.৫৭ মি. উচ্চতায় উঠেছিল।❑

নর্মদা বাঁধ ও জলাধার ঃ পরিবেশের লাভ-ক্ষতি

মালবিকা গায়েন , দ্বিতীয় বর্ষ

পরিবেশ মানব জীবনে একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; তাই যে কোন বিকাশমূলক প্রকল্প সূচনা করার আগে ঐ প্রকল্প পরিবেশের ওপর কি ধরণের প্রভাব ফেলবে তা অনুপঙ্খ বিবেচনা করা উচিত। রাষ্ট্রের পরিবেশে ধ্বংসাত্বক বিকাশ কখনোই কাম্য নয়। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়ন ঘটানো রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

সৃষ্টিজগতের প্রাচীনতম গণ্ডেয়ানাভূমি হল নর্মদা ক্ষেত্র যা মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের প্রায় ৯৮,৭৯৬ বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। এই নর্মদা উপত্যাকার বহুমুখী বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার নর্মদা ভ্যালি ডেভেলাপমেন্ট প্রোজেক্ট গ্রহণ করেন। তারমধ্যে সর্দার সরোবর একটি সবার্থসাধক নদীবাঁধ প্রকল্প। প্রায় ৩০টি বড় বাঁধ; ১৩৫ টি মাঝারি বাঁধ, এবং ৩,০০০ ছোট বাঁধ নর্মদা ও তার উপনদীর ওপর নির্মিত হচ্ছে। এই বাঁধ ও জলাধার থেকে গুজরাট ও রাজস্থানের খরা প্রবণ অঞ্চলের প্রায় ১৯,০৭,৫০০ হেক্টর শুষ্ক জমির জলসেচন, ২কোটি ৯৫ লক্ষ মানুষের পানীয় জল সরবরাহ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পশুপালনের প্রয়োজনীয় জলসরবরাহের পরিকল্পনা আছে। এই সর্দার সরোবর প্রকল্পটি ১৯৪৭সালে অনুমোদিত হয়। অনুমোদনের অব্যহিত পরে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক, আইনত প্রাযুক্তিক এবং পরিবেশ সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী প্রতিবাদের ফলে এই প্রকল্প এখনও সম্পূর্ণ রূপায়ন করা সম্ভব হয় নি। বর্তমানে প্রকল্পটি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন এর নেতা বাবা আমতে ও নেত্রী মেধা পাটকরের নেতৃত্বে পরিবেশ সংগঠনের চরম বিরোধিতায় আটকে রয়েছে।

ভারতে ৩,৬০০ বৃহৎ বাঁধের মধ্যে ৩,৩০০ তৈরী হয়েছে স্বাধীনতার পরে। আরও ১,০০০ নির্মীয়মান। কিন্তু একটিতেও নির্মাণ-পরবর্তীকালের লাভক্ষতির সমীক্ষা করা হয়নি। পরিবেশবিদদের যুক্তি অনুসারে এইরূপ বড় বাঁধ কখনোই নিরাপদ ও পরিবেশ অনুকুল হতে পারে না। সাময়িক লাভজনক হলেও দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিবেশের ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। যেমন ঃ

১) বাঁধ নির্মানের ফলে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের প্রায় ৪২,০৬১ হেক্টর অরণ্য জলের তলায় তলিয়ে যাবে। ফলতঃ বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে জীববৈচিত্র্য এক মহাসংকটের মুখোমুখি হবে।

২) উদ্ভিদ আচ্ছাদন বিনষ্টের কারণে বিশাল আয়তনের কৃষিজমি ও অর্ধশুষ্ক ভূমির ক্ষয় ত্বরান্বিত হবে।

৩)উপকুলবর্তী জেলায় প্রকল্পকৃত কৃত্রিম খালের মাধ্যমে জলসেচন-জনিত স্থায়ী জলমগ্নতার কারণে ঐ সকল অঞ্চলে লবনতার প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে।

৪) প্রকল্পটি যে অঞ্চলে রূপায়ন করা হচ্ছে তা সর্বাধিক ভূ-কম্পন প্রবন। এছাড়া জলধারের বিপুল জলরাশির স্থিতিচাপজনিত কারনে শিলাস্তরে স্থিতিশীলতার অভাব দেখা দিতে পারে।

৫) সরকারি হিসেবেই দেখা যাচ্ছে জলাধারগুলিতে প্রত্যাশিত হারের থেকে অনেক দ্রুত হারে পলি জমছে। ফলে জলধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাবে। এর ফলে এই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে যে ৩০ হাজার হেক্টর জমিকে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষার কথা বলা হয়েছে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

৬) নর্মদা প্রকল্পের জন্য মহারাষ্ট্রের ৩৩টি, গুজরাটের ১৯টি এবং মধ্যপ্রদেশের ৫৩টি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যেখানকার বাসিন্দারা সবাই আদি জনগোষ্ঠীভুক্ত। এর ফলে বহু পুরাতন সংস্কৃতির বিনাশ ঘটবে, লুপ্ত হবে প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র, অক্ষয় বট ও পুরাপ্রস্তর যুগের সব চিহ্ন।

৭) এই বাঁধের জল ভদোদরা(বরোদা), আমেদাবাদ, গাঁধীনগর, মেহসানা প্রভৃতি বিত্তবান জেলাকে সন্তুষ্ট করে যখন কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রে পৌঁছাবে তখন জলবাহী খালটি শুকনো থাকবে। ফলে রত্নসম্ভবা ধরিত্রী দিনে দিনে বন্ধ্যা হয়ে পড়বে। মৃত্তিকা অনুর্বর ও কৃষিযোগ্যতারোহিত হয়ে পড়বে।

অপরপক্ষে প্রকল্প প্রাধিকারদের মতে প্রকল্প রূপায়নে প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনও ক্ষতি হবে না। বরং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ফিরে আসবে এবং বহুলাংশে পরিবেশের উৎকর্ষ বাড়বে। এছাড়া স্থানচ্যুত আবাসিকরা উপযোগী এবং সুসংহত স্থানে পুনর্বাসন পাবে। নিকটবর্তী অভয়ারণ্যের বন্যপ্রাণীদের পানীয় জল সরবরাহ হবে। অববাহিকায় বনসৃজনের মাধ্যমে মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করা যাবে বলে প্রকল্পে বলা হয়েছে। প্রাধিকারদের মতে সেচ ব্যবস্থা ছাড়া ভারতে কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু পুরোনো পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে কত খরচ হয়। যাঁরা বাঁধ বানানোর খরচের হিসেব করেন, তাঁরা কখনও এটা ভেবে দেখেননি। বারগি প্রকল্পে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে বলা হয়েছিল, কাজ শেষের দশ বছর পরেও মাত্র ৪ হাজার হেক্টর জমি সেচের সুযোগ পাচ্ছে। তাহলে লাভটা কোথায় হল? উন্নয়নের নামে অরণ্যবাসী ও গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জমি ও অরণ্য ছিনিয়ে মানুষ বনভূমির অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে মেতে উঠেছে। নর্মদা বাঁধ প্রকল্প সাময়িক লাভজনক মনে হলেও তা দীর্ঘকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র অলাভজনকই নয়, পরিবেশের উপরেও এর বিরূপ প্রভাব সবচেয়ে বেশী।

এই দেশ, এই পৃথিবী আমাদের সবার। কেউই উন্নয়ন-পরিপন্থী নয়। কিন্তু কোন উন্নয়ন চাই! এক উন্নয়নে বড় বাঁধ-বন্যা, পরমাণুর অস্ত্র-মৃত্যু দীর্ঘায়িত করা, আর এক উন্নয়নে একান্নবর্তী পরিবারে সবার শ্রমে অর্জিত ফসলে সমান অধিকার কৃষ্টি-সভ্যতা মনুষ্যত্ব বহতা নদীর স্রোতে প্রেমে প্রাণে গন্ধে আলোকে ভূলোক-দ্যুলোক উদ্ভাষিত করা। আপনার কী পছন্দ ? ❑

অন্তরীক্ষে অরণ্যদ্রষ্টা

বর্ণালী চ্যাটার্জী, প্রথমবর্ষ

পরিবেশ দূষণরোধের অন্যতম হাতিয়ার অরণ্য এক দুর্মূল্য সম্পদ, যার ওপর নজর রাখতে হবে নিরন্তর। কিন্তু হাজার হাজার বর্গকিমি বিস্তৃত অরণ্য বিশেষতঃ সুন্দরবন বা হিমালয়ের দুর্গম অরণ্যগুলির ওপর নজর রাখা বা বছর বছর ঐ সব অরণ্য সম্পদের পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় বিজ্ঞান এগিয়ে এল কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সাহায্য করতে। ভারতীয় প্রযুক্তি নিয়ে এল দূর সংবেদন ব্যবস্থা বা Remote Sensing System । উৎক্ষেপিত হল ভারতের নিজস্ব "আই. আর. এস স্যাটেলাইট সিরিজ" যা প্রায় ৯০০ কিমি ওপর থেকে প্রতিনিয়ত তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। হায়দ্রাবাদের শাদননগরে এই সমস্ত তথ্য নিয়মিত সংগৃহীত থাকে।

আই.আর.এস উপগ্রহে প্রায় ৭২ বর্গ.মি. ভূমি একটি বিন্দুর মতো ছবিতে ধরা দেয়; ঐ রকম এক একটি বিন্দুকে বলে চিত্রমূল বা Pixel । উপগ্রহের ক্যামেরায় ছবি তোলার সময় দৃশ্যমান আলোক রশ্মির পরিবর্তে অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করা হয়। কারণ তা বায়ুমন্ডলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় অনেককম বিচ্ছুরিত হয়। আবার ঐ রশ্মি বিভিন্ন বস্তু থেকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিফলিত হয়; যেমন জলভাগ থেকে খুব সামান্যই প্রতিফলিত হয়, আবার গাছপালা থেকে অতিমাত্রায় প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে প্রতিফলন তীব্রতা বিভিন্ন হওয়ায় সহজেই শালগাছ বা বটগাছকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই ভাবে কোন বস্তুর অবলোহিত রশ্মিকে প্রতিফলিত করার সুনির্দিষ্ট মাত্রাকে বলে ঐ বস্তুর সাক্ষর বৈশিষ্ট্য বা Signature Characteristic। উপগ্রহগুলির ক্যামেরায় বিশেষ ধরনের 'স্ক্যানার' থাকে যা তরঙ্গ রশ্মিগুলিকে বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিণত করে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের তীব্রতানুসারে বিভিন্ন বস্তুর ছবি আক্ষরিকপরিসংখ্যা বা Digital Data হিসেবে ক্যামেরায় সৃষ্টি হয় যা পরে বিভিন্ন তথ্য গ্রহণ কেন্দ্রে "কমপিউটার ডিস্কে" সংরক্ষণ করা হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ভারতে অরণ্য সম্পদের মানচিত্র প্রথম তৈরী হয় ১৯৮৭ সালে 'ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার' মাধ্যমে। এরপর থেকে প্রতি দুই বছর অন্তর মানচিত্র তৈরী হয়ে আসছে। দেখা গেছে প্রতিবছর প্রায় ৪৭০ বর্গ কিমি হারে বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে। ন্যাশনাল রিমোট সেনসিং এজেন্সীর দেওয়া তথ্যানুসারে ১৯৮০এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে ১৮৬৪ বর্গকিমি ও সমগ্র ভারতে ৯৪,৮৪০ বর্গকিমি অরণ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বর্তমান ভারতের মোট বনভূমির পরিমান ২০% এর কম। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহের তোলা ছবি আরো উন্নত হয়েছে। আশা করা যায় অরণ্য সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে তা নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

জনসম্পদ বনাম জনবিস্ফোরণ

পীযূষ পাইক, দ্বিতীয় বর্ষ

আজ থেকে ৪০/৫০ বৎসর আগে জনসংখ্যার পূর্বাভাষ যাঁরা তৈরী করতেন বিদ্বজ্জন মহলে তাদের গবেষণা সম্বন্ধে বেশ কিছুটা অনীহার ভাব প্রকাশ পেত। Stanford University এর অধ্যাপক J.S. Davis ১৯৪১ সালে American and Western Economic Association এর এক সভায় বলেন ' আমি খুবই লজ্জিত যে অন্যান্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী সহকর্মীরা মত জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের মতামত ও সিদ্ধান্ত আমি সরল বিশ্বাসে মেনে নিলাম। আজ আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে জনসংখ্যা সম্বন্ধে সব থেকে ভাল পূর্বাভাষও মোটেই প্রত্যয়াযোগ্য নয়; ২০-২৫ বৎসর তো দূরের কথা এমনকি ৫ বৎসর ব্যবধানেও'। জনসংখ্যা সম্বন্ধে তার বিশ্লেষণ আমরা ভারতের ১৯৯১ এর জনগণনা থেকে বুঝতে পারি।

জনসংখ্যা বা বেকারত্ব দূরীকরণকোন দিকেই কোন আশার আলো দেখতে পারলো না ১৯৯১ এর জনগণনা রিপোর্ট। রেজিস্টার জেনারেল অফ্ ইন্ডিয়ার তরফে ওই রিপোর্টে একটি বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণটি কম্পিউটারে জানা গেছে যে আগামী দশকগুলিতে দেশের জনসংখ্যা ১০০ কোটিতে থেমে থাকার নয়। তা কেবল বেড়েই চলবে। বাড়বে জনসংখ্যায় সবচেয়ে এগিয়ে থাকা রাজ্য উত্তর প্রদেশও । সাত দশকের মধ্যে এই প্রথম মধ্যপ্রদেশে অত্যধিক জনবৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকলেও মহারাষ্ট্রের বেড়েই চলবে জনসংখ্যা। কেরালা ও তামিলনাড়ুর জনসংখ্যার স্থিতাবস্থা দেখাগেলেও অন্ধ্রপ্রদেশ আরও পাঁচ বছর পর সেই অবস্থায় পৌঁছতে পারবে বলে কম্পিউটার জানিয়েছে।

তথ্যে আরও জানা গেছে যে জনসংখ্যায় ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের হার কমে গেছে আগের দশকের তুলনায়। বেড়েছে ৬০ বৎসর বা তার বেশী বয়সী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার হার। মোট জনসংখ্যার ৬৭ শতাংশ মানুষ বছরে ১৮৩ দিনের বেশী কাজ পান।এদের মধ্যে ৫১ শতাংশ পুরুষ ১৬ শতাংশ মহিলা। এরাই দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কর্মীবাহিনী আর প্রান্তিক কর্মীবাহিনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর যে সব নারী পুরুষ ১৮৩ দিনের কম কাজ পান তাদের মধ্যে ৫১.৬ শতাংশ পুরুষ ২২.৩ শতাংশ মহিলা। মেয়েরা ক্যাজুয়াল কাজে বেশী নিযুক্ত হন। দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কোটিরও বেশী। ৫-১১ বৎসর বয়সী এই শিশুদের অর্ধেক মেয়ে। তবে দেশের প্রায় ৩০ কোটি মানুষের কোন কাজ নেই। এদের মধ্যে দেড় কোটি বেকার যুবক-যুবতি। পুরুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। মহিলারাও বিয়ের ব্যাপারে অধিকতর বয়সে পৌঁছে যাচ্ছেন পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এই সব বাড়া-কমার মধ্য দিয়ে বেড়েই চলেছে স্থানান্তর মানুষের সংখ্যা। প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে জনসংখ্যা এসেছে প্রায় দশ কোটি। তাই আগামী শতকে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতবর্ষের এক বিরাট সমস্যা যা শতাব্দীরও বটে।

অকাল মৃত্যুর দিকে পৃথিবী !

সৌমিত্র মন্ডল, প্রথম বর্ষ

না চমকে ওঠার কোন কারণ নেই ২৬.১০.২০২৮ তারিখে ঘটতে চলেছে মহাসংঘর্ষ। যার ফলে অকালে ধ্বংস হবে পৃথিবী। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটে 'পৃথিবীর অকাল মৃত্যু।'

ঘটনার সূত্রপাত

৬.১২.১৯৯৭ রাতের আকাশে একটি নতুন গ্রহাণু আবিষ্কার করলেন অ্যারিজোনার বিজ্ঞানী জীম স্কটি। ১.৬ কিলোমিটার ব্যসের ঘন্টায় ৭৫ হাজার কিলোমিটার গতিবেগে সোজা পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসা ঐ গ্রহাণুর নাম দিলেন XF II, এই ঘটনা তিনি জানালেন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মার্সেডেনাকে । মার্সেডেন অনেক হিসাব করে বললেন ২৬.১০.২০২৮ তারিখে ঘটতে চলেছে মহাসংঘর্ষ। XF II এর বিস্ফোরণ ক্ষমতা ৫ লক্ষ মেগাটন। হিরোসীমায় যে বিস্ফোরণ হয়েছিল তার মাত্রা ছিল মাত্র ০.০১৫ মেগাটন।

পৃথিবীর সঙ্গে XF II এর সংঘর্ষ হলে কি হবে

১) ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত গন্ধক বাতাসের সঙ্গে মিশে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী করবে যার প্রভাবে পৃথিবী সমস্ত জীবজগৎ ধ্বংস হতে পারে।

২) XF II এর ধাক্কায় পৃথিবী খন্ড খন্ড হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হতে পারে।

৩) XF II এর ধাক্কায় পৃথিবীর পাথর আকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে এবং পৃথিবীতে পাথরের বৃষ্টি ঘটাবে।

এই মহাসংঘর্ষ কি সত্যি হতে পারে ?

এই সংঘর্ষ না হওয়ার কোন কারণ নেই। বিজ্ঞানীরা বলেছেন এর আগে ১৩৯ বার পৃথিবীতে এই ধরনের সংঘর্ষ হয়েছে।

১) ৬ কোটি বছর আগে মেক্সিকোর য়ুকাটানে এই ধরনের সংঘর্ষ হয়েছিল যার ফলে পৃথিবীর ৭০ শতাংশ জীব ধংস হয়েছিল।

২) ১৯০৮ সালের জুন মাসে সাইবেরিয়ার অজুস্কা অঞ্চলে উর্ধাকাশে এক ধূমকেতুর বিস্ফোরণের ফলে ১১২৬ বর্গকিলোমিটার বনভূমি ধ্বংস হয়ে যায়।

৩) নাসার বিজ্ঞানী এলিনার হেলিন হিসাব করে দেখেছেন XF II পৃথিবীর প্রায় ৪৮ হাজার কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যাবে।

৪) মার্সেডেন বলেছেন XF II এর কাছ দিয়ে যদি আরেকটি গ্রহাণু বেরিয়ে যায়, তবে সংঘর্ষ ঘটবে।

তা হলে উপায় !

১) XF II এর কাছে বোমা বিস্ফোরণ করে তার গতিপথ পরিবর্তন করা।

২) একটা আশার কথা বলেছেন প্রয়াত জ্যোতির্বিদ কার্ল সাগান । এমন ঘটনা ঘটার আগে প্রযুক্তি এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে যে মানব জাতি মহাকাশ যানে চড়ে অন্য গ্রহে পাড়ি দেবে।

জন্ম মৃত্যুর মাঝে থাকতেই পারে অকাল মৃত্যু। তাই পৃথিবীর অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে যে কোন সময় ; তা আজ অথবা ২৬.১০.২০২৮ তারিখ। এই মহাসংঘর্ষ ঘটার আগে হয়তো আমরা চলে যাব অন্য কোন গ্রহে। ❑

কুমেরু মহাদেশে শৈত্য কমে আসছে

চন্দন মিশ্র, দ্বিতীয় বর্ষ

একবিংশ শতাব্দীর আর্বিভাবলগ্নে একটা চিন্তা উদিত হয়েছে আমাদের মনে। তা হোল প্রকৃতির হঠাৎ খাম খেয়ালী আচরণ কিসের জন্য। তবে কি পৃথিবী ধ্বংসের মুখে ? গুজব যাই হোক, পৃথিবীর ভারসাম্য যে বিশাল দোলা খেয়েছে তা কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। বিজ্ঞানীরা বলেছেন ক্রমশই বদলে যাচ্ছে দক্ষিণ মেরুর প্রকৃতি ও পরিবেশ। সারা বছরই তুষারাবৃত প্রচন্ড ঠান্ডার দেশ অ্যান্টার্কটিকায় গত ৫০ বছরে তাপমাত্রা বেড়ে গেছে গড়ে ২.৫° ডিগ্রি সেলসিয়াস। যেখানে গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ঘোরা ফেরা করে ০° সেলসিয়াসের আশেপাশে সেখানে গত কয়েকটি গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ঘুরেছে ১০°-১২° ডিগ্রির মধ্যে। কমে গেছে এখানকার কুখ্যাত 'ব্লিজার্ড' বা তুষারঝড়ের সংখ্যা। তুষারের রাজ্যে সীমানা হলেও এটা যে উষ্ণতা বৃদ্ধিরই ফল হিসাবেই ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। 'উইন্ড বিল' বা ভীষণ ঠান্ডা এবং প্রচন্ড বাতাস-এর ঘটেছে ব্যতিক্রম। সব মিলিয়ে উষ্ণতা বাড়ছে অ্যান্টার্কটিকায় এবং গলতে শুরু করেছে সেখানকার বরফ। যে হারে বরফ গলছে। তার পরিণতি কিন্তু ভয়ানক। প্রবল জলস্ফীতিতে ভেসে যেতে পারে বহু জনপদ।

আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে 'Nature' পত্রিকায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে, অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে ' গ্রীন হাউস এফেক্ট' এর পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হয়েছে। এই গ্রীন হাউস এফেক্ট বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলাফল সে ভীষণ তা অনেকেরই জানা। পৃথিবীর মোট বরফের ৯০ শতাংশই জমে আছে আন্টার্কটিকা মহাদেশ ও তার আশে পাশের সমুদ্রজুড়ে। আবহাওয়ার যে পরিবর্তন আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের বরফের কিছু অংশও যদি গলে যায় তাহলে পৃথিবীর যাবতীয় সমুদ্রের জলস্তর ছাড়াবে তার বিপদসীমা। আর তাতে রেহাই পাবেনা অনেক শহর জনপদ। উপকুলবর্তী বহু শহর ও নগরগুলি হবে প্লাবিত। শেষ হয়ে যাবে বহু প্রাণ, বহু সভ্যতা; পৃথিবী হবে ধ্বংসের সম্মুখীন।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ কি ?

তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে বায়ুমন্ডলে এরোসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। বায়ুমন্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ায়ের এরোসলের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে পৃথিবীর চতুর্দিকে সৃষ্টি করে একটি ছাতার মত আস্তরণ। পৃথিবীপৃষ্ঠে সৃষ্ট বা বিকিরীত তাপ ঐ ছাতায় প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে আবার ভূ-পৃষ্ঠেই। এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ার মূল কারণ। অ্যান্টার্কটিকায় উত্তাপ বৃদ্ধির কারণ আবার অন্য। ১৯৮৫ সালে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন দক্ষিণ মেরুর বায়ুমন্ডলের ওজোনস্তরে তৈরি হয়েছে 'ওজোন হোল'। ওজোনস্তরে ফাটলের পরিণতি সাংঘাতিক। আর সূর্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মির সরাসরি পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রবেশ কিন্তু ভীষণ মারাত্মক। নানা রকম চর্মরোগ বা স্কিন ক্যানসার সহ আরও ভয়ঙ্কর রোগের আশঙ্কা এতে থাকে। আর ওজোন স্তরে এই ফাটলের জন্য দায়ী কিন্তু মানুষ নিজেই।

মহাকাশে মহানক্ষত্র 'ইটা ক্যারিনি'

মধুমিতা ভূঞ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ

মহাকাশে ইটা ক্যারিনি (Eta Carinae) নামে একটা তারা আছে। উত্তর গোলার্ধ থেকে এই তারাটা দেখা যায় না। তাই আমরা যারা উত্তর গোলার্ধে বাস করি তারা এই তারাটাকে দেখতে পাই না। দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে এটা দেখা যায়। কখনও খালি চোখে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই খালি চোখে দেখা যায় না। ইটা ক্যারিনি মহাকাশের সব থেকে বড় তারা। এর ভর সূর্যের ১২০ গুণ। আমাদের ছায়াপথের প্যাঁচালো বাহুতে এর অবস্থিতি। আমাদের থেকে ৭৫০০ আলোক বর্ষ দুরে। একে খুব একটা দেখা যায় না; কারণ এটার উজ্জ্বলতা পরিবর্তনশীল। আমাদের সৌর জগতে যেখানে সূর্য অবস্থিত সেখানে যদি ইটা ক্যারিনি থাকত তাহলে তা মঙ্গল গ্রহ পযর্ন্ত জায়গা জুড়ে থাকত। অর্থাৎ এর ব্যস ৬০ কোটি কিমি। অন্যতম বিজ্ঞানী ক্রিস ডেভিডসন ২০ বছরের উপর ইটা ক্যারিনি নিয়ে গবেষণা করেছেন। এর উষ্ণতা বেশী তাই বাইরের রঙ লাল দেখায়। ইটা ক্যারিনির বর্তমান বয়স ১ লক্ষ বছর হলেও এটা ত্রিশ লক্ষ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। এবং আয়ুর শেষের দিকে এগোলে এটা সুপারনোভা হবে। এই ধরনের তারা জ্বালানীর ফুরিয়ে গেলে শেষ পর্যায়ে হয় সুপারনোভা। তারাটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে; ইংরেজীতে বলে Impiosion বাইরের শত কোটি সূর্যের সমান উজ্জ্বলতা নিয়ে মহাশূন্যে ছিটকে পড়বে। এই সুপারনোভার মধ্যে তৈরি হবে পিরিয়ডিক টেবিলের সমস্ত মৌলিক পদার্থ—লৌহ থেকে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত কত কিছু। নিজের মধ্যে ছোট হতে হতে শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাক হোলে পরিণত হবে।

১৮৪৮ সালে এক " স্কাইওয়াচার" সর্বপ্রথম এই তারাটাকে দেখতে পান। তিনি নির্ণয় করেন লুব্ধক (Sirius) নক্ষত্রের পরেই এর স্থান। ১৯৯০ সালের পর ব্রাজিলের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আগাস্টো ডামিনেলি বলেন ইটা ক্যারিনির বর্ণালী বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে তারাটা বাড়ছে কমছে। ইনফ্রারেড দুরবীন দিয়ে দেখা গেল সাড়ে পাঁচ বছর পর পর এই তারা উজ্জ্বলতা বাড়া কমা হচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা:

বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন এবার যেটা ঘটবে সেটা সুপারনোভা পর্যায়ের। অর্থাৎ একটু হাইড্রোজেন উগরে তারাটা আগের মত আর হবে না। গোটা তারা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এবং বাইরের দিকটার বেড়ে শত কোটি সূর্যের মত উজ্জ্বল হবে। আর এর ফলে প্রচুর পরিমানে গামা রে উৎপন্ন হয়ে পৃথিবীর দিকে তেড়ে আসবে। এই ভাবে গামা রে পৃথিবীর দিকে তেড়ে এলে পৃথিবীর সমস্ত জীবকোষগুলিকে মেরে দিতে পারে। এই জন্য বিজ্ঞনীরা ইটা ক্যারিনিকে খুব মন দিয়ে দেখছেন। তাঁদের জানবার বিষয়বস্তু হোল—

১। ইটা ক্যারিনি সম্পর্কে অজ্ঞাত তথ্য সংগ্রহ করা।

২। এটা প্রকৃতই সুপারনোভা হচ্ছে কিনা সেটা জানা।

সুপারনোভা হলে কিছু করার নেই। বাইরের খোলসটা পৃথিবীর উপর ছিটকে আসবে শত কোটি সূর্যের উজ্জ্বলতা নিয়ে সুপারনোভা। আর তারার দিকে নিজের মাধ্যাকর্ষণে নিজে ছোট হতে হতে ব্ল্যাক হোল হবে। ইটা ক্যারিনি আর দেখা যাবে না। মৃত্যু হবে সূর্যের ১২০গুণ ভারি তারার। ❑

চোরাবালি

স্বর্ণালী আদক , দ্বিতীয় বর্ষ

'চোরাবালি' এই কথাটির সঙ্গে আমাদের সবারই কিছু না কিছু পরিচিতি আছে। কিন্তু এই চোরাবালি কিভাবে সৃষ্টি হয় তা অনেকেরই অজানা। সংবাদপত্রে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই চোরাবালিতে আটকে যাওয়ার কথা। আসলে চোরাবালি হল জল ও বালির মিশ্রণ। অধিকাংশ বালি আবৃত অংশ সম্পূর্ণ শুষ্ক হয়না। কারণ এর মধ্যবর্তী অংশে ভূ-গর্ভস্থ জল অবস্থান করে। কোন কারনে যদি বালির এই অবক্ষেপন আলোড়িত হয় তাহলে Quick Sand বা চোরাবালির সৃষ্টি হতে পারে। বালির অবক্ষেপনের মধ্য দিয়ে জলের উর্ধমুখী প্রবাহ দেখা যায় এবং উপরের বালুকণার ওপর চাপ প্রয়োগ করে এবং এই চাপ কণাগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে স্পর্শ করিয়ে রাখে। এটা বালিকে প্রবাহী পলল বা তরলে রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়াটি ইংরাজীতে liquefaction বা তরলীকরণ নামে পরিচিত। চোরাবালি যেখানেই দেখা যায় সেখানেই বালির মধ্য দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ জল উপরে উঠতে থাকে, কারণ স্থানীয় ভূ-তাত্ত্বিক শর্তাবলী এটির স্পর্শীয় অনুভূমিক প্রবাহকে বন্ধ করে দেয়।

কিভাবে সৃষ্টি হয় ?

সাধারণত ভূ-কম্পনজনিত কারণে চোরাবালি গঠিত হয়। যখন কোন অঞ্চলে আর্দ্র বালুকা রাশি আলোড়িত হয় ও অধিকতর ঘনভাবে সংযুক্ত হয় তখন এটি আয়তনে হ্রাস পায় এবং ছিদ্রপথে জমে থাকা জল বেরিয়ে যায়। এই জল উপরে উঠে আসার চেষ্টা করে এবং উপরিস্থিত বালুকনার উপরে চাপ সৃষ্টি করে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে। তরলীকৃত বালি এবং জলের এই মিশ্রণের কিছুটা উপরের দিকে উঠে আসার সময় উপরের স্তরকে অবিন্যস্ত করে দেয় এবং গঠন করে অনিয়মিত কর্দম বা Sediment যাকে Sediment Sand dyke বলা হয়। ❑

আবহমন্ডলে ওজোনস্তর ও আমরা

রঞ্জিত জানা, প্রথম বর্ষ

ভূমিকা :

আকাশ আর বাতাসের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই পৃথিবীতে ঘটেছিল প্রাণের আবির্ভাব। নির্মল বাতাস আর মমতা মাখানো আলো, প্রাণকে করে তুলল আরো প্রাণময়। কিন্তু মানুষের অন্তহীন লোভ নির্মল বাতাস আর মমতা মাখানো আলোয় ছড়ালো বিষ। ফলে সূর্য-তারা ভরা আকাশে আবহমণ্ডলের স্তরে তৈরি হল অতিবেগুনী রশ্মি প্রবেশের গহ্বর ; বিশ্বভরা প্রাণ হতে চলল বিপন্ন।

ওজোন স্তর ও তার গঠন : ওজোন হল এক ধরনের গ্যাস; অক্সিজেনের সঙ্গে যার তফাৎ খুব সামান্যই। তিনটি অক্সিজেন পরমাণু জুড়ে তৈরি হয় একটা ওজোন অণু। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এর ওপরের অংশে যেখানে বায়ুর উষ্ণতা ০° সেলসিয়াস সেখানেই রয়েছে ওজোন স্তর। এই স্তরই প্রাণীকুলকে অতিবেগুনী রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করে চলেছিল। আজ আমরা অবতীর্ণ হয়েছি তারই ধ্বংস সংকল্পে।

ওজোনস্তর হ্রাসের কারণ : আজ গোটা পৃথিবী জুড়ে চলছে যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির পালা। তৃতীয় বিশ্বে কম হলেও, উন্নত দেশের কর্তারা পরিবেশের বিনিময়ে যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতি পিছিয়ে দিতে আগ্রহী নয়। ফলে তাদের গড়ে তোলা একাধিক কারখানায় উৎপন্ন হচ্ছে CFC (ক্লোরোফ্লুরো-কার্বন), যা ওজোন স্তর হ্রাসের প্রধান কারণ। এক একটা ক্লোরিণ পরমাণু ১,০০,০০০ ওজোন অণুকে ভেঙে ওজোন স্তরকে তছনছ করে দিচ্ছে।

উত্তর গোলার্ধ ও ভারতের আকাশে ওজোন স্তর :

যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আবহমণ্ডলে ক্রমবর্ধমান দূষণের ফলে ওজনস্তর আরো বেশীমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। না প্রকৃতি তাদের কাউকেই ক্ষমা করেনি। ফলে দক্ষিণের আকাশে দেখা দিয়েছে ওজোন গহ্বর, আর দক্ষিণের মহাদেশ অস্ট্রেলিয়াতে দেখা দিয়েছে চর্ম-ক্যানসার। কিন্তু উত্তর গোলার্ধের ব্যাপারটা কেমন? উত্তর গোলার্ধে কোন ওজন গহ্বর পাওয়া যায়নি। ভারতের আকাশে ওজোন স্তরে তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। সারা পৃথিবী জুড়ে যেখানে ওজোনস্তর গড়ে ১১০-১১৫ ডবসন ইউনিটের মধ্যে থাকে, সেখানে ভারতের উর্ধাকাশে ওজোন লেভেল রয়েছে ২৪০-৩৫০ ডবসন ইউনিটের মধ্যে। তবে দক্ষিণ ভারতে নিরক্ষরেখার কাছাকাছি গ্রীষ্মকালে অতিবেগুনী রশ্মির কিছু বর্ষণ ঘটে। কিন্তু ইউরোপের দেশগুলোতে CFC উৎপাদনের পরিমাণ বেশি বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন ৫০°-৯০° উঃ অক্ষাংশের মধ্যে ওজোন স্তর বিনষ্ট হওয়ার সম্ভবনা প্রকট হচ্ছে। দক্ষিণের বিপদে আমরা যদি উদাসীন থাকি, তাহলে ঐ বিপদের তীর একদিন আমাদের দিকেও ছুটে আসবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই দূষিত, উষ্ণ, আবর্জনা কন্টকিত আমাদের প্রিয় গ্রহটি আজ ভাগের মা। তার প্রতি দায়িত্ব পালনে কেউ তেমন তৎপর হচ্ছে না; তবুও এই পৃথিবীই মানুষের শেষ ও একমাত্র আশ্রয়।❑

বিপন্ন দীঘা সৈকত

তাপস প্রধান, দ্বিতীয় বর্ষ

বঙ্গোপসাগরের উপকুল-সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলা ও ওড়িশার সীমান্তবর্তী সৈকত শহর দীঘা। বিগত কয়েক দশক ধরে সৈকতভূমি ক্ষয়ের (Beach erosion) ফলে দীঘার প্রাণকেন্দ্র পুরনো দীঘা জর্জরিত। যদিও সৈকত ক্ষয় চলছে বহু বছর আগে থেকে, তবু এর কারণ অনুধাবন ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত গবেষণা ও কার্যক্রম শুরু হয় মাত্র ১৯৬০ এর দশকের পর থেকে। বঙ্গোপসাগর উপকুলের চাঁদিপুর উপকুল যেখানে প্রায় ৪ কিমি প্রশস্থ সেখানে দীঘা উপকুলের পূর্ব পশ্চিমে ৭ কিমি উপকুলের মধ্যে ৪ কিমি প্রচন্ড রকম সৈকত ক্ষয়ে জর্জরিত। দীঘার সমুদ্র ক্রমাগত স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসার আতঙ্কিত দীঘার উন্নয়ন পর্যদ, বিভিন্ন হোটেল কর্তৃপক্ষ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের সাধারণ মানুষ। বিগত কয়েক দশকে দীঘার উপকুল কতটা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে তা এবং ভারতীয় উপগ্রহ চিত্র এবং ঐ উপকুলের Survey of India প্রকাশিত 1968-69 এর Topoesheet যদি পাশাপাশি রেখে তুলনা করি তা বুঝতে পারা যাবে।

সৈকত শহর দীঘাকে ঐ ভয়াবহ ক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগ ক্ষয়ের প্রকৃত কারণ অনুধাবন না করে বা পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনা না করে ১৯৪৭-১৯৮২ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে প্রায় ৩.৫ কিমি. উপকুলে প্রাচীর (Sea wall) দেওয়ার কাজ শুরু করে। এই প্রাচীর দেওয়ার ফলে উপকুলের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। সমুদ্রের স্বাভাবিক ক্ষয়কারী শক্তি ঐ প্রাচীরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সৈকতভূমিকে (Beach) ক্রমাগত ক্ষয় করে নীচু করে দিচ্ছে। বিগত ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ঢেউ ঐ প্রাচীর অতিক্রম করে দীঘা শহরকে প্রচন্ড রকম সংকটে ফেলে দিয়েছিল। দীঘা উপকূলের 'সি হক্' হোটেলের কাছে প্রাচীরটি প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার ঠিক পরে উপকূল প্রাচীরের (Sea wall) উচ্চতা বাড়িয়ে ৫.৫ মিটার করা হয়েছে। পুরনো দীঘাতে সৈকতভূমি ও উপকুলের ক্ষয় ছাড়াও রয়েছে নানা পরিবেশগত সমস্যা। কোন পরিকল্পিত পরিবেশবিধি ও মৎস্য সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি না থাকায় সৈকতভূমিতে ক্রমাগত দূষণ বাড়ছে। তাছাড়া এত বড় সৈকত শহরের দুই শতধিক হোটেল ও পর্যটক আবাসের জন্য কোনো আবর্জনা পরিশোধন প্রকল্প নেই। ফলে কোন প্রকার পরিশোধন ছাড়াই তরল ও কঠিন আবর্জনা সরাসরি সমুদ্রে মিশে সমুদ্রকে দূষিত করছে ও উপকুলের বাস্তুতন্ত্রকে বিঘ্নিত করছে।

বিভিন্ন সমুদ্র বিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিক, গবেষক ও পরিবেশবিদদের গবেষণায় জানা গেছে দীঘার সৈকতক্ষয়ের প্রধান কারণ হল সারা বছর তীর্যক সমুদ্র স্রোত দীঘার উপকুলে ক্রিয়াশীল হওয়া ও সৈকত গঠনের প্রধান উপাদান পলল, বালুকা যোগান কমে যাওয়া। দুরসংবেদী উপগ্রহ চিত্রে (Sattelite Imagery) দেখা গেছে সুবর্ণরেখা মোহনায় দীঘার দিকে আড়াআড়ি একটা spit

তৈরী হওয়ায় দীঘার দিকে পলল ও বালুকার পরিবহন (Sediment supply) বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ঐ Spit এর মুখটি কেটে দিয়ে পলির পরিবহন স্বাভাবিক করতে পারলে দীঘার উপকুল ক্ষয়কে অনেকাংশে কমানো যাবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন। এছাড়া উপকুল বরাবর Mangrove বনভূমি স্থাপন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ ধরা ও সুনির্দিষ্ট পরিবেশ বিধিস্থাপনই দীঘাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাবার একমাত্র দীর্ঘ ও স্থিতিশীল পদ্ধতি বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে যেহেতু সুবর্ণরেখা মোহনা ওড়িশ্যা রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত তাই আমাদের প্রয়োজন সুবর্ণরেখা মোহনায় ঐ spit টিকে কেটে ফেলাও আইনসিদ্ধ নয়।

পরিশেষে বলা যায় প্রকৃত উপকুল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীয় ও আন্তঃরাজ্য একটি সাংগঠনিক নিয়ম ও উপকূলের পরিবেশ নিয়ে নিরন্তর পর্যবেক্ষণ এবং বহুশাখার (Multidisciplinary) গবেষণার পুঞ্জীভূত ও মিলিত উন্নয়ন পদক্ষেপ (Development Strategy)।❑

দীঘার পর্যটন শিল্প বনাম ওদের বেঁচে থাকা

দেবপ্রকাশ পাহাড়ী ও উৎপল রায়
বিভাগীয় সহায়ক

যে বালুকাবেলার জন্য দীঘার সমুদ্র সৈকত একসময় উল্লেখযোগ্য সমুদ্র পর্যটন স্থান হিসাবে পরিচিত ছিল বর্তমানে সেই বালুকাবেলা আর নেই । তার পরিবর্তে পুরানো দীঘার সমুদ্রতট এখন গ্রানাইট, ল্যাটেরাইট ও কংক্রীটে মোড়া । নতুন দীঘার কিছু অংশ বালুকাময় থাকলেও লোকালয় ও পর্যটক আনাগোনা কম হওয়ায় সন্ধ্যার পর প্রায় সুনসান হয়ে যায় তবুও কলকাতার নিকটবর্তী সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুক্ত ও কম খরচে ছুটি কাটানোর স্বাস্থ্যকর পর্যটন কেন্দ্র এই দীঘা । ৫.৫ কি.মি. দৈর্ঘ্যের এই উপকূলীয় ভ্রমণ ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা সামাজিক সমস্যাও বেড়ে চলেছে । ভ্রমণপিপাসু মানুষেরা আজ তা সঠিক ভাবে উপলব্ধি না করলেও আর্থসমাজবিদদের চোখ তা এড়িয়ে যেতে পারে নি । গ্রাম্য সহজ সরল জীবনযাপন প্রণালী ও সাবলীলতা কাটিয়ে মানুষের মনে জটিলতা ও অধিক অর্থ উপার্জনের চাহিদা ক্রমে বেড়ে চলেছে । কম বয়স থেকে শিক্ষার প্রতি অমনোযোগী ও অর্থ উপার্জনের চেষ্টা সেইসঙ্গে অভিভাবকদের অর্থলিপ্সা এতই প্রবল যে তাঁরা তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যত উন্নতির কথা না ভেবে তাদের কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে উপার্জন করার চেষ্টা করেন । দীঘার ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবছরে ছেড়ে চলে যাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই এর প্রমাণ দেয় ।

বহিরাগত পর্যটকদের আচার ব্যবহার ও আধুনিক পোশাক-পরিচ্ছদে আছে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব যা শিশুমনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তার ফল হিসাবে মানসিক ভারসাম্যহীনতা ও আত্মহননের চেষ্টাও দেখা যায়। কিছু শ্রেণীর মানুষ অত্যাধুনিক আমোদবিলাসে গা ভাসিয়ে তাদের দৈনিক সামান্য উপার্জন ড্রাগ ও বিনোদনের (সিনেমা, ভি.ডি.ও) পিছনে ব্যয় করে। দীঘার ভিডিও পার্লার, ক্যাসেট ও বিদেশী পানীয়ের রমরমা ব্যবসা ও নানাপ্রকার 'A' মার্কা চলচ্চিত্রের প্রসার অবক্ষয়ের অপর একটি কারণ । কম ও মাঝারী বয়সী ছেলেমেয়েদের আধুনিক পোশাক-আশাকেও অনুকরণের চেষ্টা দেখা যায় । তাদের উপার্জনের তুলনায় আনুসাঙ্গিক ও বাহ্যিক চাকচিক্যের দরুণ ব্যয়ভারও অধিক। এই স্থানের সাধারণ মানুষ ছলচাতুরি ও প্ররোচনার মাধ্যমে ভ্রমণকারীদের নানারকম ভুল বুঝিয়ে কম পরিশ্রমে কিভাবে বেশী অর্থ উপার্জন করা যায় তার চেষ্টায় রত হয়। অভাব থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় গরীব ও নিম্নশ্রেণীর মানুষজন হোটেলের কাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে । কিন্তু দালালির দ্বারা অর্থ উপার্জনের পথকে সহজউপায়ে মেনে নেয় । বাস স্টপেজে দূরপাল্লার বাস ঢোকার পর হোটেলের বুকিং এর জন্য কমিশন পাওয়ার আশায় দালালদের ছোটাছুটি দেখে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। লভ্যাংশের পরিমাণ বুঝে এইস্থানের মানুষ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পেশারও পরিবর্তন করে। পর্যটক সমাগমের সময় নানা প্রকার ক্ষণস্থায়ী রুজি ও রোজগারের পথ যেমন ডাব বিক্রি, চলমান চায়ের

দোকান, মশলামুড়ি, নুলিয়া, ঘোড়সওয়ার বৃত্তিকে বেছে নেয় । পুরুষেরা প্রাথমিক বৃত্তি যেমন মাছ ধরা, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত তেমনি অপরদিকে বাড়ির মহিলারা দোকানের বিক্রেতা থেকে শুরু করে বাড়িতে বসে গৃহকাজের সাথে সাথে কুটীর শিল্পের দ্বারা শাঁখ , ঝিনুক ও সৌখীন কাজের মাধ্যমে উপার্জনের চেষ্টা করে। যদিও তাদের পরিশ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিকের পরিমাণ বেশ কম । দীঘার পার্শ্ববর্তী গ্রামে মানুষের কৃষির প্রতি আকর্ষণ ও একসময় উপার্জনের অন্যতম বৃত্তি পান বরোজের প্রতি নজরও অনেক কমে গেছে । সেই তুলনায় ব্যবসা, মাছ ধরা, জাল ও নৌকা ভাড়া দেওয়া, এবং রাজমিস্ত্রীর কাজের প্রতি স্থানীয় মানুষের ঝোঁক বেশী । কারণ এই পেশাতে অল্পসময়ে উপার্জন অনেকবেশী। নতুন নতুন হোটেলও অট্টালিকা নির্মাণের প্রয়োজনে রাজমিস্ত্রীর চাহিদাও এখন অনেক বেড়েছে ।

হোটেলগুলিতে ম্যানেজার ও বাইরের থেকে আসা উচ্চপদের মানুষের অবস্থান এবং স্থানীয় জনসাধারণের ক্ষোভ নানা বৈষম্যের সৃষ্টি করে, যা সময় বিশেষে বৃহৎ রূপ নেয়। রাজনৈতিক প্রভাব এক্ষেত্রে বেশ স্পষ্ট । বিভিন্ন ইউনিয়ন যেমন হোটেল ইউনিয়ন, ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন, রিক্সা ইউনিয়ন, ছাড়াও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়নও গজিয়ে উঠেছে । তাছাড়া নুলিয়া, ক্যামেরাম্যান, হকার, ঘোড়সওয়ার প্রভৃতি কাজে যুক্ত লোকেদের মধ্যেও নানা ইউনিয়ন তথা দলবাজি দেখা যায়। নানাপ্রকার ঝামেলা, উন্নয়ণ, জমিক্রয়-বিক্রয়, এইসব নানা ব্যাপারে অপ্রত্যক্ষ হাত আছে রাজনীতির ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্থানীয় জেলে ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়াশুনো করে । যার সুপ্রভাব অপেক্ষা কু প্রভাব অনেক বেশী । দোকানপাট, হোটেল, হকারবৃত্তি প্রভৃতি কাজে শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ যথেষ্ট । এখানে শিক্ষার পরিবেশ ও পরিকাঠামো ঠিকমত গড়ে না ওঠায় সামাজিক অবক্ষয় ক্রমবর্ধমান । সরকারী কর্মচারীদের কাজের বাইরে অন্যান্য কাজকর্মের প্রতি মনোযোগ, বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাজে অর্থবিনিয়োগ এবং চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক আয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকতে দেখা যায়। কারণ এই পরিবেশে তাদের অর্থলিপ্সাকে বাড়িয়ে দেয়। প্রতিটি মানুষ নিজেকে নিয়ে ভাবতে এতই ব্যস্ত যে, পরিবেশের অবনমন কিভাবে হচ্ছে বা ভবিষ্যতে কি ক্ষতি হতে পারে সেই সম্বন্ধে নুন্যতম ধারণা তাদের মনে উদ্ভব হয় না । বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষামূলক সমীক্ষা করার প্রয়োজনে প্রশ্নাবলী নিয়ে গেলে তাদের অবহেলা ও অমনোযোগিতা থেকে অসচেতনতার প্রমাণ মেলে। সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বিনিময়ে কোন আর্থিক সুবিধা না পাওয়ায় বা ব্যক্তিস্বার্থ লাভের গন্ধ না থাকায় সেইসবের পেছনে সময় দেওয়ার প্রয়োজন বোধও তারা করে না ।

বিভিন্ন মাধ্যম থেকে দৈনিক উপার্জন বৃদ্ধি পেলেও স্বামী স্ত্রীর কাজে ব্যস্ততা, শিশুদের প্রতি তাদের অবহেলা ও মানসিক পরিবর্তনের জন্য অনেকাংশে দায়ী । উপহার সামগ্রীর অত্যধিক মূল্য পর্যটকদের অসন্তোষের একটি কারণ । তবে বর্তমানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা মোটামুটি

সঠিক মূল্য নির্ধারিত হওয়ায় সেই সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার প্রসার ও বৃদ্ধি লাভ ঘটছে। কিছু কিছু স্থানীয় মানুষ যাদের বিনিয়োগ ক্ষমতা নেই তারা ঐ পর্যটন কেন্দ্রের রাস্তার ধারে নানারকম খেলা দেখিয়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেন। যেমন বোতলের ব্যালেন্স, রিং খেলা, তাস খেলা ইত্যাদি। মাঝেমধ্যে কিছু মহিলাও শিশুকে ভাটার সময় তট থেকে পয়সা ও অন্যান্য সামগ্রী খুঁজতেও দেখা যায়। দীঘার পর্যটন শিল্প আজ এইরূপ নানা আর্থসামাজিক সমস্যার সম্মুখীন।

EDUCATING RURAL CHILDREN : THE PROBLEM OF ACCESS AND AWARENESS

Sumana Bandyopadhyay
Lecturer
Ranjan Jana & Soma Dey, 2nd Year

Education is a basic requirement of our society, but often we find that its access is difficult for a large section of the population. This is primarily due to the fact that in most poor and developing economies, poverty is a major hindrance to the access to educational infrastructure. The concern therefore shifts to the fact whether the governments of these countries are giving the requisite priority to education as a basic need and whether there is adequate social responsibility to enforce such prioritisation.

In a recent study (December, 2000) conducted by the students of the Rural Development & Planning, Department of Geography & Environmental Management, Vidyasagar University in the Nayagram village in Medinipur district, it was found that there is a need to reset the priorities. It is not enough to have primary schools, there must be adequate teaching aids, adequate training, and a thrust on the awareness of the parents of the children who discontinue immediately after the fourth standard .

It was found that Nayagram village has good access to four primary schools. Apart from Nayagram Primary School, there are three others namely, Kamlatola, Dahi and Sitalpura within a radius of one kilometer. The Nayagram Primary School, with its meagre funds and other inputs, is still making a considerable difference to the concept of children's education. The most remarkable among such efforts is the experiment with "Joyful Learning Scheme", which is a venture of the UNICEF and aims at training teachers in adopting various playful, colourful and enjoyable communication and participation techniques for teaching. The school is sending about 10-12 students each year from the third and fourth standards to compete at the Vigyan Medha Pariksha conducted by the Vigyan Manch. Every step in the direction of improving the quality of primary education is a commendable effort. Many such small efforts might lead to a giant leap towards progress as such attempts to take care of the child's formative years.

Sadly enough, these efforts will not be fruitfully utilised in the case of inadequate participation and lack of awareness. The most crucial aspect is

the number of dropouts immediately after fourth standard. The participation in primary schools is high because the service is provided free of cost.Drop outs immediately after that, has indicated that poverty is one of the primary causes. The other cause is that education is clearly seen as a non-profitable venture as there is no guarantee of financial returns; this mindset must be changed.

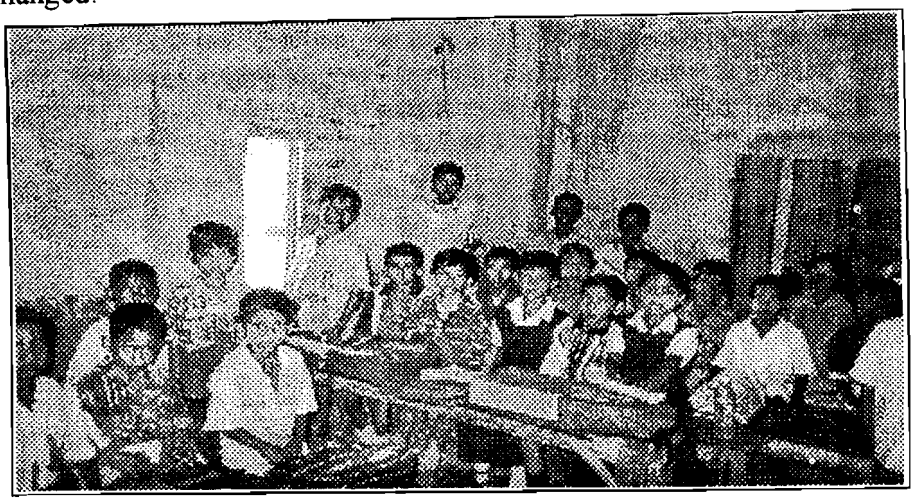

Plate 1 : Class hour in a Primary School in Nayagram

The other issue of great concern is the fact that "child labour" has not been removed from either rural or urban areas. In many schools in rural areas, as in Nayagram, harvesting periods witness approximately 40-50% absenteeism in almost every class - is there really no alternative for sending children to the fields during school sessions ? In some families the female children are utilised for domestic labour instead of sending them to school.

It is not enough to provide free compulsory education for the First to Fourth standards. The system must cater to all children between the ages 6-14 years as was recommended years ago in the Sargent Plan of 1944 prepared by the Central Advisory Board of Education and later included in the Constitution. This still remains a distant dream.

The question is whether the right to education is merely a phrase or may ever be a reality for the millions of children in India ? And whether the Government is giving adequate priority or not ? The State has failed to perform its duty to introduce free, compulsory and universal education for children aged between 6-14years and on the other hand a large section of the population has failed to change their attitude towards education.

As the Editor of the Peoples Union for Civil Liberties, Dr. R.M.Pal recently pointed out in an article entitled *Right to Education* that the Article 45 of the Constitution has never been taken seriously and he adds that "...without a change in the mindset, implementation of this Right will continue to remain a distant goal."

Plate2 : Domestic life of a tribal family in Nayagram

This implies three important facts. Firstly, that there is a need to build the political will as the states must come out of their present state of inactivity and prioritise education with a vengeance. It is well known that Governments of almost all advanced countries took up sole responsibility of the education sector and financed it fully - Japan did so in as early as 19th Century and the results are before all to see. In our country where poverty is the greatest hindrance to education, the role of the State becomes all the more important and population growth cannot be used as an excuse. Secondly, progressive institutions, both formal and informal should take education to the top of their agenda. Thirdly, we must take the responsibility to increase the awareness levels of the parents in poor families mostly in rural areas and make them realise that education is not to be equated with financial gains and losses. All this calls for collective social responsibility to ensure that the right to education does not remain a prophetic inscription but is converted to a real right for every child.

CAUSES, CONSEQUENCES AND MANAGEMENT OF EARTHQUAKE DISASTER: AN ANALYSIS IN THE LIGHT OF THE RECENT EVENTS IN GUJARAT

Novendu Kar
M.Sc. 2nd Year Class

Introduction

The Greek word *Seismos* means to quake and thus seismology is the study of earthquakes. An earthquake is a shaking of the ground, usually caused by rock rupturing stress. Earthquakes occurring in the outermost layer of the earth's' crust, where rocks are strong and brittle and about ninety per cent of the earthquakes takes place along the Plate boundaries. Rock's temperature increase with depth from the surface of the earth at the rate of 25°C per km. At depths greater than 20km the rocks become hot and tend to act as a fluid rather than as a hard substance. Earthquakes are basically shock wave that is transmitted from an epicenter, which can lie from the earth's surface to 700 km beneath the earth's crust (Bryant, E.A. 1991). The waves of an earthquake are of three types: *P waves, S waves* and *L waves*. We know from our knowledge of Geotectonics that both *P* and *S* waves pass through the interior of the earth and make no direct impact on the earth's crust, whereas *L* wave, from the earthquake centre is trnsmitted to the epicentre on the earth's surface vertically above the centre and continues to spread tangentially across the earth's surface. Its power of destruction depends upon the intensity as measured in Richter scale (from 0 to 10).

Geotectonic causes of earthquake in the Indian subcontinent

Forces of structural deformation still cause substantial amount of shaking and deformation through the earth. Geophysicists estimate that as many as 35 significant earthquakes occur over the globe every year, including about 18 major ones like those occurred in Gujarat on the 26th January 2001.

Earthquakes occur more frequently in parts of India because its landmass lies adjacent to the region where the greatest continental collision on the earth is taking place. About a hundred million years ago when the dinosaurs roamed about the continental areas, the so-called Tethys Sea lay partly between the Indo-Australian and the Eurasian Plates. About forty million years later, the Indo-Australian Plate collided with the Eurasian Plate. The collision was in a very slow motion in time-scale, the closing speed being only about 2 cm a year (The Statesman, 29.1.2001), but the energies generated were colossal - the collision area between the two plates had crumpled and pushed upwards to form the Himalaya, the greatest mountain range on the planet. The impact is still being felt and the Himalaya is still rising. Satellite data received in recent years estimates that the rate of ascent of this

mountain is about 5mm a year. So an earthquake of the magnitude of 7.9 Richter Scale through the shoulder of the Indian Plate (around Gujarat) is not unprecedented.

Achindranath Mitra, a renowned scientist and Professor of Geological Sciences of Jadavpur University, Kolkata maintains that activation of old and dormant fault lines passing through Gujarat could be a cause behind the recent devastating earthquake (*cf.* The Statesman, 28.1.2001). He also believes that Bhuj, as it is located between the Nagarparkar fault line in the north and Kathiawar fault line in the south, received the maximum impact of the earthquake.

The following map of India exhibits the earthquake intensity zones through the country.

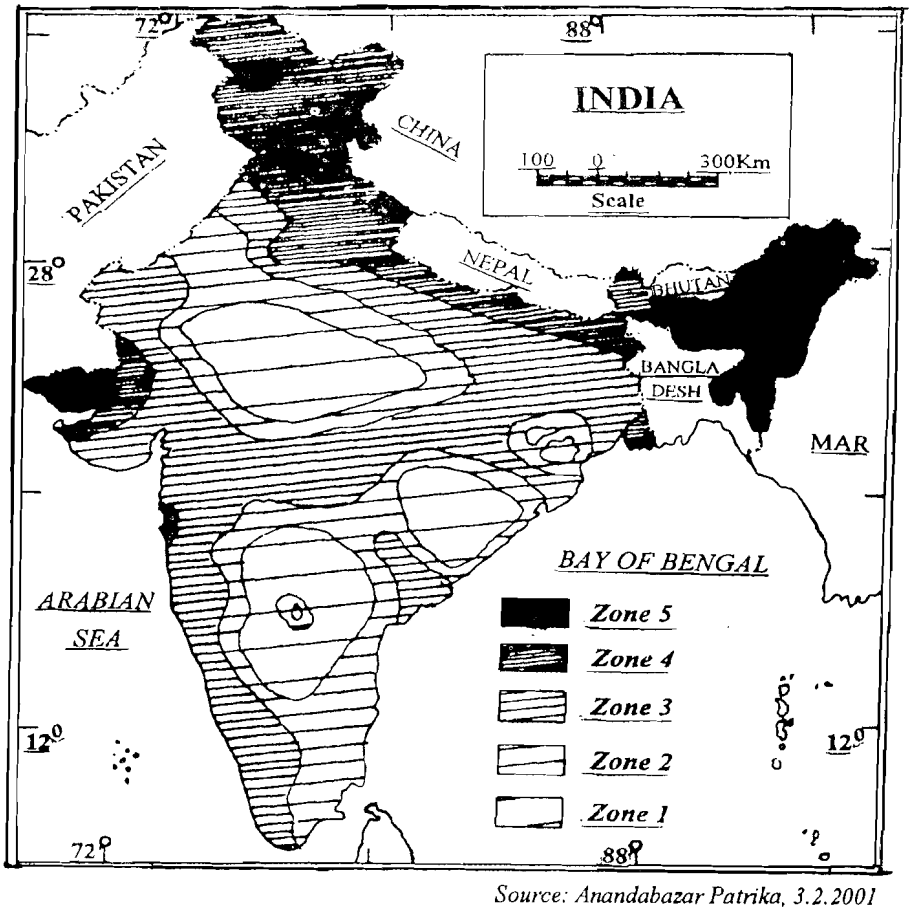

Source: Anandabazar Patrika, 3.2.2001

Figure 1: Map of India showing the earthquake intensity zones through the country

A table (Table 1) has also been presented below to summarise the significant earthquake disasters in the Indian subcontinent over the last three centuries.

Table 1: Major earthquakes and their tolls in different parts of India over the last three centuries.

Time	*Location*	*Effects*
Oct. 11, 1737	South Bengal (around Kolkata)	About 300,000 persons died, the worst possible earthquake in India in its recorded history.
June 16, 1819	Kutchh area of Gujarat	About 2,000 persons died, Bjuj city was destroyed, rise of a landmass in a length of 15km in the Runn of Kutchh, known as Allah Bandh.
June 16, 1828	Kashmir	About 1,000 persons died
January 10, 1869	Assam	Disasters over an area of about 2,50,000 km^2, the course of Brahmaputra and many of its tributaries changed
May 30, 1885	Kashmir	About 3,000 persons died
April 4, 1905	Kangra Valley	About 2,000 persons died, the entire Punjab was affected
January 5, 1934	North Bihar and adjacent Nepal	About 10,700 persons died.
August 15, 1950	Assam	About 15,000 persons died, devastating floods in the rivers of Assam
Sept. 30, 1993	Latur in Maharashtra	Over 11,000 persons died.
May 22, 1997	Jabbalpur in M.P.	About 50 persons died
January, 26, 2001	Bhuj in Gujarat	More than 100,000 persons perished, causing about Rs. 25,000 crores.

Source: Sing, S. (1991)

Earthquake Disaster Management, Risk Assessment and Prediction

Coping with earthquake: In recent years most of the countries with developed technological skill have formulated plans for coping with earthquake disasters. The main target is to reduce the impact of earthquakes and then save lives, building and money. In order to reduce the damaging effects of earthquake necessary measures and precautions including development of technology for earthquake prediction and formulation of appropriate building design are absolutely essential.

Preparation: Earthquakes have killed about 1.5 million people over the world in the 20^{th} century and the number of earthquakes appears to be rising. Most of the deaths have been caused by the collapse of unstable and poorly designed buildings. It is interesting to note that more than one third of the world's largest and faster

growing cities are located in regions of high earthquake-risk areas, hence the problems are likely to intensify. It is almost impossible to stop earthquake from occurring, thus prevention normally involves minimising the possibility of death, injury or damage by avoiding construction of buildings in high-risk areas and using aseismic designs. In addition warning system can be used to warn people of an imminent earthquake. Insurance schemes are another form of preparation, by sharing the cost between a wide group of people.

Buildimg Design: As the availability of suitable land becomes scarce and the building cost rises, more and more people continue to encroach upon seismic land areas. This certainly increases the potential impact of an earthquake. Single-storied buildings are more suitable shock-resistant than the multi-storied structures. Basement isolation *i.e.*, mounting the foundation of a building on rubber mounds, which would allow ground to be more elastic, can withstand earthquake shocks. Building reinforcement strategies include building on foundations built deep into underlying bedrock and the use of still-constructed frames that can withstand shaking. Landuse planning is another important way of reducing earthquake risk (Guinness & Nagle, 1999).

Earthquake Prediction: From direct experiences the scientists have gathered a number of methods of detecting earthquakes. These are as follows:

a) Distortion of fences, roads and building are some examples;

b) Changing levels of water in bore holes is another signal;

c) Statistical data of the earthquake records are very important tools for earthquake prediction (Coch, 1995). The probability of future earthquake occurrence can be calculated from long-term experience;

d) In addition satellite can now be used to measure the position of points on the surface of the earth;

e) People living in the countryside report that from a few days before the occurrence of a major earthquake the animal behaviour changes remarkably; they become restless and continue to yell.

Earthquake Hazards and the Human Survival: The concept of possible control upon major earthquakes is rather enigmatic. However, many geo-scientists working on the stress and strain mechanisms of the constituent materials of the earth's crust and mantle have put forward some suggestions. In theory by altering the fluid pressure deep underground at the point of greatest stress in the fault line, may trigger a series of small and less damaging earthquake events risk (Guinness & Nagle, 1999). This could release the energy that would otherwise build up to create a major event. Additionally a series of controlled underground nuclear explosions might relieve stress before it reaches a critical level.

In order to visualise the possible nature of the future earthquakes mapping of the sensitive seismic zones on a certain period of interval is required. For mitigation measures the principal roles are to be played by the Government. Assessment of the possible earthquake hazards may be made considering the advice received from the experts. Also to overcome this type of natural hazard awareness campaigning among the people, living in the earthquake-prone areas, is also very important (Mukhopadhyay, 2001, *personal communication)*.

References

Bryant, E.A. (1991): *Natural Hazards.* Cambridge Univ. Press.

Coch, N.K., (1995*): Geohazards: Natural and Human.* Prentice Hall, New Jersey.

Guinness, P. & Nagle, G., (1999): *Advanced Geography: Concept and Cases.* Hodder & Stoughton

Mukhopadhyay, A.D., (2001): Disaster and its Management. *Seminar Lecture delivered in Vidyasagar University on 19.2.2001.*

Sing, S. (1991): *Environmental Geography.* Prayag Pustak Bhawan, Allahabad.

The Statesman, (29.1.2001): *SCITECH, THE TERROR.*

The Statesman, (28.1.2001): *Report.*

The Anandabazar Patrika, (3.2.2001): Earthquake Zone Map of India.

UNDERGROUND WATER-TABLE CONDITION AROUND MEDINIPUR TOWNSHIP AREA

Guru Prasad Chattopadhyay
Professor
&
Subhankar Acharya and **Susmita Bag**
Student of M.Sc. 2nd Year Class

Need for underground water table survey in the Medinipur Township area: Medinipur Township area, being situated on the dry lateritic and semi-lateritic landscape, is considered as a distinct drought-prone area and the supply of water, during the drier months of the year becomes scarce and erratic. The two main sources of water supply for the township (Municipal area) are 1) the River Kansabati, and 2) the underground aquifers. Under the existing drought conditions it has become imperative to explore the condition of underground storage of water and its potential for maintaining supply through the built-up areas. The ***State Water Investigation Department (SWID)*** and the ***Department of Public Health Engineering (PHE)*** have conducted some pilot works of investigation over the last few years, but the data and information available from these works are not adequate to reach any decision about the intra-sectoral variation of the depth of water-table (aquifer) below ground level through the town. The main purpose of this environmental survey is to prepare water table maps of the Medinipur Township (Municipal) area of respective seasons, and identify the potential wet and dry zones. The research team of our university department comprising students of the M.A./M.Sc. classes, under the guidance of the Head of the Department, has been investigating upon conditions of the underground water-table around this township area through seasons over the last four years since 1997. This account is a report of the latest survey done in the month of December 2000.

Method of Investigation: For the purpose of the underground water table survey seventeen (17) main sectors of the township of Medinipur have been identified, and the water-table *below ground level* (BGL) from 20 to 30 dug-wells in each sector have been measured using a Plumb bob and a measuring tape. All measurements through dug wells have been taken during the early morning hours to avoid any possible error, since progressive lifting of water from the wells beyond the early morning hours would show a temporary and artificial lowering of the water-table.

The seventeen (17) sectors of the township from where water table (BGL) have been measured are: 1) Tantigeria, 2) Rangamati, 3) Ashok Nagar-Nepalipara, 4) Police Lines, 5) Michael Madhududan Nagar, 6) Kshudiram Nagar, 7) Rajabajar,

8) Karnelgola, 9) Mirbazar-Barabazar area, 10) Aligunj, 11) Judges Court, 12) Jagannath Mandir, 13) Sarat Palli, 14) Bidhan Nagar, 15) Rabindra Nagar, 16)Burge Town, and 17) Mitra Compound. In each sector as mentioned above 20 major dug wells were selected and the water level in each of these was measured using a plumb bob fitted string and a measuring tape.

The collected data have been scrutinised in the laboratory and plotted on the respective location on the base map of the township. A mean value of the depth of water table have been considered in the cases of almost equal values of data points collected in each sector. The processed values of data generated thereby have been plotted on the respective sectors of the map and Isopleth lines showing the water table below the ground level have been drawn at an interval of one metre. The underground water-table map of the Medinipur township area prepared thereby is presented in Figure 1.

Variation of the underground water table in December 2000

Reason for the areal variation of the underground water table: Variation in the condition of the underground water table around Medinipur Township area is directly associated with a) the underground structural conditions of the rocks and b) the amount of infiltrated water received from precipitation through seasons. Hard lateritic layer, with variable thickness is extended through this township. This plays a significant role in controlling the pattern of the subsoil water reserve from area to area within the township. The other controlling factor is the amount of water received from precipitation through seasons. It is a certain fact that percolation of precipitated water mainly during the rainy season every year recharges the underground water table or the aquifer. The average annual rainfall received in this township area, as counted from the last 8 years' (1992-99) record, is about 154cm.

Pattern of the aerial variation of the underground water table; an interpretation of the Water table Map of Medinipur: Within the main township area the water table appears to vary from 1.0m below ground level (BGL) to over 8.0m BGL. A certain pattern has emerged here. The most favourable zone, with water table ranging between 2.0m and 3.0m BGL, occurs through the west-central part of the township extending at north-south direction form Ashok Nagar through Burge Town to Mitra Compound. To the east the water table gradually subsides to about 4.0m BGL (up to Aligunj) and to the further east-southeast the water table again rises up to a convenient level of 2.0 BGL (around Cornelgola and Nagar Chak). In between these zone there occurs another small pocket around the southern fringe of Rabindra Nagar, where the water table remains only at 2.0m. To the northeast, beyond the Police Lines the water table subsides quite rapidly and around Uday Pally (to the east and the northeast of the Central Jail), it is found below 8.0m from the ground surface. The water table gradually subsides almost at the similar rate from the

Ashok Nagar - Mitra Compound area to the west and northwest. Around our Vidyasagar University Campus it was found between 7.0m and 8.0m BGL. However, the water table very distinctly subsides through Tantigeria, Rangamati and Sarat Palli sectors. With the extension of the dry and thick lateritic soils in this

MEDINIPUR MUNICIPALITY AREA
Underground Water Table Condition
(December 2000)

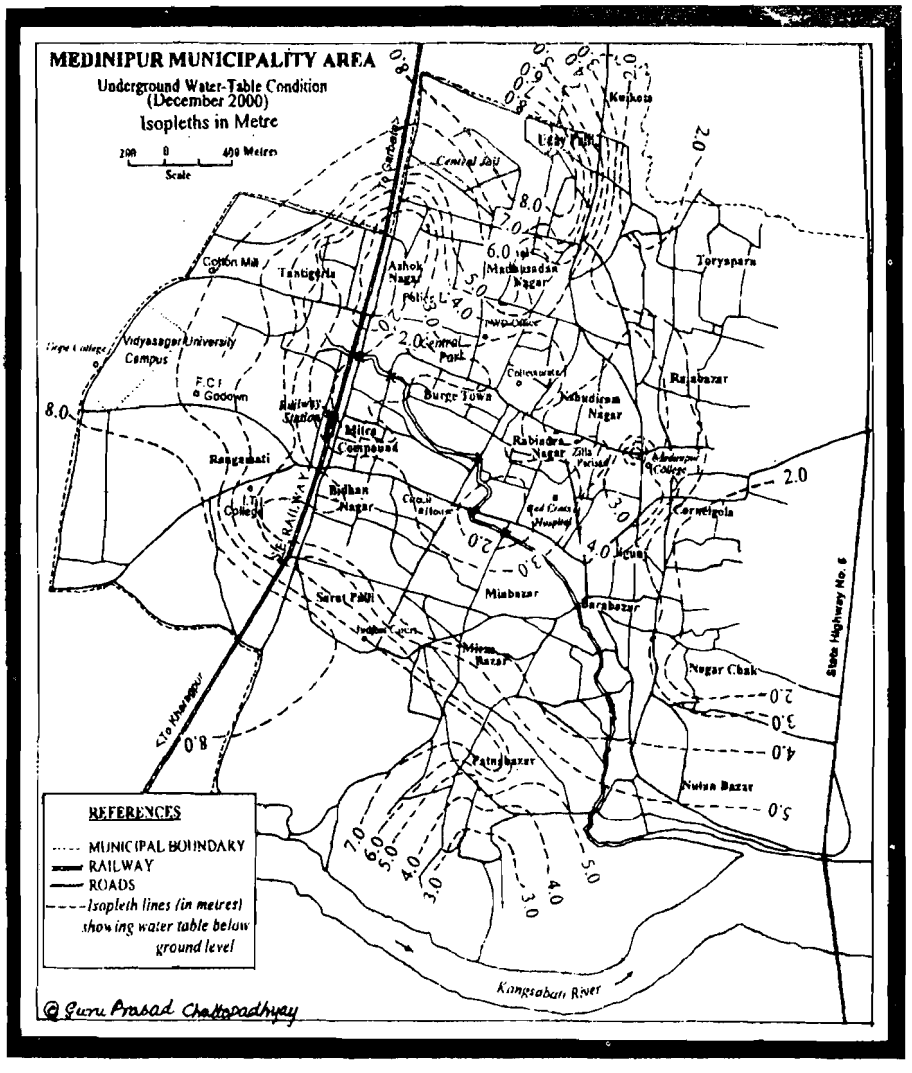

Source : Field Investigation

Figure : 1

part the water table sharply goes down, sinking below 8.0m. In the sectors to the south and southwest of Rangamati and Saratpalli virtually no subsurface water table was found.

It is obvious that with the progresses of drier season through the months of January, February, March, April and May the condition of the underground water table will be more critical, and some sectors of the township, like, Uday Pally, Rangamati and Sarat Pally will have to rely entirely on the supply of water through the Municipality water supply system. The authors believe that for any future planning of the extension of the township the administrative authority and the planners concerned will have to consider the above information of investigation carefully.